Vol. 31 | No. 2 | 1988

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ময়মনসিংহ-গীতিকা চর্চা

Volume	31
Issue	2
Year	1988
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৈয়দ আজিজুল হক
Published online	February 1, 1988
DOI	10.62328/sp.v31i2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v31i2.5
Pages	157-188
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

ময়মনসিংহ-গীতিকা

Check for updates

সৈয়দ আজিজুল হক

লোকসাহিত্যকে জাতীয় আত্মপরিচয়ের উৎস হিসেবে মূল্যায়নের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে শিল্পবিপ্লবজাত রেনেসাঁ-যুগের বিবেচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। জাতীয় সত্তার আত্মআবিষ্কারের প্রেরণা থেকেই আধুনিক যুগে লোক-সাহিত্য সংগ্রহ, সংকলন ও পুনর্মূল্যায়নের আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। নবজাগরণ-যুগের সাহিত্যে ঐতিহ্য অনুসন্ধান, ঐতিহ্য অনুকরণ ও ঐতিহ্যের পুনর্বিবেচনা একটি নতুন মাত্রা হিসেবে চিহ্নিত। সেকারণে আধুনিক যুগের বিবেচনায় অপরিশীলিত মননসৃষ্ট হলেও লোকসাহিত্য-শরীরে ঐতিহ্যের নানা সূত্র বিধৃত থাকায় ঐতিহ্য-অনুসন্ধানী এযুগের কবি-সাহিত্যিকদের নিকট লোকসাহিত্য বিশেষ আগ্রহের বিষয়। লোক-সাহিত্যের আধুনিক মূল্যায়ন কিংবা একে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার প্রয়াস এই আগ্রহ সৃষ্টির পেছনে ক্রিয়াশীল। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম লোকসাহিত্যের নবমূল্যায়নের মাধ্যমে এর প্রতি অনেক পণ্ডিত-মনীষীর আকর্ষণ সৃষ্টি করেন। পরবর্তীকালে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, লাল বিহারী দে, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, দীনেশচন্দ্র সেন, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং আরও পরে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডক্টর মযহারুল ইসলাম, ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, আবদুল হাফিজ প্রমুখর আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু লোকসাহিত্য সংগ্রহ, সংকলন, সম্পাদনা কিংবা অন্য দেশের লোকসাহিত্যের সঙ্গে তুলনাবিচারের ক্ষেত্রে এদেশের জাতীয়তাবাদী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ মনীষীগণ যত নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন, এর পুনর্মূল্যায়ন, নবমূল্যায়ন কিংবা আধুনিক পরিশীলিত মননসমৃদ্ধ বিবেচনায় তাঁদের তত অভিনিবেশ পরিলক্ষিত হয় না। ফলে সংগ্রহ-সংকলন-সম্পাদনা ও তুল্যবিচারই বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত গীতিকাসমূহের মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও এবক্তব্য যথার্থ।

ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে চন্দ্রকুমার দে কর্তৃক সংগৃহীত গাথাগুলি দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত হয়ে 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে। অতঃপর 'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা' নামে আরও তিনটি খণ্ডে ময়মনসিংহ সহ বর্তমান বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে সংগৃহীত গাথাগুলি দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় যথাক্রমে ১৯২৬, ১৯৩০ ও ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয়। চারটি খণ্ডে সংকলিত চুয়ান্নটি গীতিকার মধ্যে উনচল্লিশটি গীতিকাই বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত এবং এই গীতিকাগুলিই জীবনভাবনা ও কাব্যগুণে তাৎপর্যমণ্ডিত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

বাংলাদেশ থেকে অলিখিত এই সাহিত্যের সমৃদ্ধ নিদর্শনসমূহ উদ্‌ঘাটিত হওয়ার পর দেশে-বিদেশে এ নিয়ে বিশেষ প্রশংসাকর মন্তব্য উচ্চারিত হয়। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ চিহ্নিত কালপর্বে সাধারণ অশিক্ষিত পল্লীকবিগণ রচিত এ সব গীতিকায় নরনারীর স্বাধীন প্রণয়-বাসনা, ধর্ম ও শাস্ত্রশাসন-উর্ধ্ব অসাম্প্রদায়িক চেতনা, চরিত্রসমূহের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও অভিরুচি চরিতার্থতাকল্পে জীবনপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার দৃঢ়চিত্ততা, প্রকৃতিঘনিষ্ঠ জীবনচেতনা ও অপূর্ব কাব্য-কলাগুণ প্রভৃতি বিধৃত থাকায় স্বাভাবিকভাবে তা আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন মনীষীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কিন্তু বিস্ময়কর ও দুঃখজনক যে প্রকাশিত হওয়ার পর অর্ধশতাব্দী-কাল অতিক্রান্ত হলেও বাংলা-ভাষী সাহিত্য সমালোচক-গবেষকগণ এর যথার্থ ও পূর্ণায়ত মূল্যায়নে অগ্রসর হননি। আজ পর্যন্ত ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার বিশ্লেষণের ওপর কোনো পূর্ণাঙ্গ স্বতন্ত্র গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচিত হয়নি। ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত গাথাগুলির মূল্যায়ন করে একমাত্র প্রথম স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ যেটি প্রকাশিত হয়েছে, তা ইংরেজি ভাষায় এবং তার রচয়িতা বাংলা-ভাষী নন।

১

বাংলা-ভাষী সমালোচক-গবেষকগণ যে ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা সম্পর্কে আদৌ কোনো আলোচনা করেননি, তা নয়। কিন্তু এই গীতিকাসমূহ সংগ্রহ-সংকলন-সম্পাদনার ক্ষেত্রে প্রধান উদ্যোগী

দীনেশচন্দ্র সেন এর সামাজিক ও সাহিত্যমূল্য সম্পর্কে যতটা উচ্ছ্বসিত মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন কিংবা এর আলোচনায় বাংলা-ভাষী সমালোচক-গবেষকগণের আগ্রহী হওয়ার ব্যাপারে যে-আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন, পরবর্তীকালের বিক্ষিপ্ত আলোচনায় তা ততখানি দৃষ্টিগোচর হয় না। কিংবা বিদেশী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মনীষীগণ যতটুকু প্রশংসার দৃষ্টি নিয়ে গীতিকাগুলি পাঠ করে এর উচ্চ কাব্যমূল্যের কথা উচ্চারণ করেছিলেন, বাংলা ভাষার আলোচনা ও মূল্যায়নে ততটুকু গুরুত্ব ব্যক্ত হয়নি।

দীনেশচন্দ্র সেন বলেছিলেন, "প্রথম যেদিন বঙ্কিমবাবুর বিষবৃক্ষ, রবীন্দ্রের নৌকাডুবি ও শরৎচন্দ্রের রামের সুমতি পড়িয়াছিলাম,—তাহারও পূর্ব্বে যেদিন মধুসূদনের মেঘনাদের ডমুরুর ধ্বনি কর্ণরন্ধ্রে মন্দ্রিত হইয়াছিল সেই সকল দিনের কথা আমার মনে আছে, তাহা কখনই ভুলিব না। এই পালাগানের শ্রেষ্ঠ গানগুলি পাঠ-কালে আমার মনের উপর ততোধিক বিস্ময় ও আনন্দের প্রবাহ চলিয়া গিয়াছিল। পল্লীগ্রামের পথে কানাকড়ি খুঁজিতে গিয়া যেন আমি স্বর্ণ-মুদ্রার ভাণ্ডার পাইয়াছি। আশ্চর্য্যের বিষয় আমরা জানিনা যে বঙ্গ দেশের পল্লীলক্ষ্মী এইরূপ শত শত রত্ন তাঁহার অঞ্চলে কুড়াইয়া রাখিয়াছেন।"[১] দীনেশচন্দ্র সেন আবিষ্কার-গৌরবে হয়ত অধিকমাত্রায় উচ্ছ্বাসমণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু বিশ্বখ্যাত মনীষীগণের মন্তব্যে ভাবাবেগ ছিল না। রোমাঁ রোলাঁ, মরিস ম্যাটারলিঙ্ক, সিলভ্যান লেভী, জর্জ গ্রিয়ারসন প্রমুখ মনীষীর উচ্চ প্রশংসামূলক মন্তব্যসমূহ ছিল যথার্থ ও যুক্তিনিষ্ঠ।

রোমাঁ রোলাঁ ময়মনসিংহের পল্লীকবি মনসুর বয়াতীর রচনা 'দেওয়ানা মদিনা'র ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করে বলেন, "মদিনার চরিত্র-চিত্রণে যে অপূর্ব গ্রাম্যশ্রী ও শিল্প-নৈপুণ্য প্রদর্শিত হয়েছে, তা কোন কৃষক কবির নিকট হতে আমি প্রত্যাশা করিনি"।[২]

শিল্পাচার্য রোদেনস্টাইন বলেছিলেন, "এই পালাগানের নায়িকাগুলির চরিত্র পাঠ করে মনে হচ্ছে যেন অজন্তা গুহার চিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে আমার চক্ষের সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। ইহাদের লীলায়িত ভঙ্গি ও লাস্যের মনোহারিত্ব আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।"[৩]

ড. সিলভ্যান লেভি লিখেছেন, "এই পল্লী-কৃষককুলের রচিত সাহিত্য-রসে আমি ডুবিয়া আছি। ইহাদের প্রসাদে আমি ফরাসী দেশের অতি শীতল আবহাওয়ায় বাস করিয়া আপনাদের নির্মল রৌদ্রোজ্জ্বল শ্যামল দেশ এবং প্রকৃতির মুক্তাঙ্গনে দাম্পত্য জীবনের কবিত্বলীলার মাধুরী অনুভব করিতেছি।"[৪] অন্যত্র তিনি বলেছেন, "মহুয়া পড়িয়া মনে হইল এই শীতের দেশে থাকিয়াও যেন আমি ভারতবর্ষের বসন্ত ঋতু উপ-ভোগ করিতেছি। এই কাহিনীর নদের চাঁদ ও মহুয়ার প্রেম চিরনবীন আলেখ্যের মত আমাকে আকৃষ্ট করিতেছে"।[৫]

হগম্যান বলেছেন, "নায়িকাগুলি শেক্সপীয়র ও রেইনীর স্ত্রীচরিত্রের মত য়ুরোপের ঘরে ঘরে পঠিত হওয়া উচিত। আমি এবং ম্যাতামসিলা এভিলইন রোলাঁ (রোমাঁ রোলাঁর ভগিনী) পল্লীগীতিকাগুলি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিতে চাই। প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ আমি ভারত-বর্ষের সাহিত্য পড়িয়া আসিতেছি, কিন্তু হঠাৎ যে এমন অপূর্ব জিনিস পাইব, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না।···"[৬] তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, "মেটারলিঙ্ক ও ফরাসীর সর্বপ্রধান লেখক বা নায়ক-নায়িকা অপেক্ষা বাংলা পল্লীগীতির নায়ক-নায়িকারা শ্রেষ্ঠ, ইহাদের সৌন্দর্য সর্বকালস্থায়ী, বরং যুগে যুগে সমালোচকগণ ইহাদের নূতন নূতন সৌন্দর্য আবিষ্কার করিবেন।"[৭]

ড. স্টেলা ক্রামরিশ 'মহুয়া' সম্বন্ধে বলেছেন, "আজ তিনদিন যাবৎ মহুয়া, হোমরা, ও নদের চাঁদের চিত্র আমার মাথায় ঘুরিতেছে। সমস্ত ভারতীয় সাহিত্যে আমি এরূপ সুন্দর একটি গল্প পড়ি নাই।"[৮]

মার্কিন লেখক অ্যালেন বলেছেন, "গীতিকাব্যগুলি পড়িয়া মনে হইল বঙ্গদেশ এখনও তাহার যৌবন হারায় নাই"।[৯]

ভারতীয় শিক্ষা বিভাগের একসময়কার পরিচালক ওটেন সাহেব বলেছিলেন, "যদি বাঙালী এই গীতিকাগুলির আদর করে, তবেই বুঝিব তাহারা উন্নতির পথে যাইবার শক্তি হারায় নাই। শহরের ধোঁয়ার মধ্যে বাস করিয়া এবং নিরবচ্ছিন্ন শকটের ঘর্ঘর রব শুনিয়া কান ঝালা-পালা হওয়ার পর হঠাৎ যদি কেহ পদ্মানদীর অবাধ সৌন্দর্য দেখে, তাহাতে যেমন তাহার একটি মুক্তির আনন্দ হয়—একরাশ কৃত্রিম

সাহিত্য পাঠ করার পর এই পল্লী গীতিকাগুলি পড়িলে তেমনই একটা নবজীবনের স্ফূর্তি পাওয়া যায়"।[১০]

বিদেশী মনীষীগণের মন্তব্য পক্ষপাতদুষ্ট কিংবা একদেশদর্শী হওয়া অসম্ভব। কিন্তু তাঁদের এই উচ্চ মূল্যায়নের তাৎপর্য বাংলা সাহিত্যের সমালোচক-গবেষকদের রচনায় পরিলক্ষিত হয় না। বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গে এসকল গীতিকার ওপর বিশ্লেষণমূলক কোনো স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার উদ্যোগহীনতার মধ্যেই এই অনাগ্রহ লক্ষণীয়। বিচ্ছিন্নভাবে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সংগ্রহ-সংকলন-সম্পাদনা প্রসঙ্গে, কেউ সাহিত্যের ইতিহাস রচনা প্রসঙ্গে, কেউ লোকসাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে কিংবা মধ্যযুগের সাহিত্যের কাব্যমূল্য বিচার প্রসঙ্গে উদ্যোগী হয়েছেন। কিন্তু এঁদের কারো আলোচনাই পূর্ণাঙ্গ নয়। অন্যদিকে সাহিত্যের ইতিহাস রচনা কিংবা মধ্যযুগের সাহিত্য বিশ্লেষণ করতে গিয়েও অনেকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছেন ময়মনসিংহের গীতিকা ও পূর্ববঙ্গের গীতিকা প্রসঙ্গটি।

২

ময়মনসিংহ-গীতিকার মূল্যায়ন প্রসঙ্গ আলোচনার পূর্বে এর সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে যে শ্রমঘন সাধনামূলক উদ্যোগসমূহ পরিলক্ষিত হয়, তার বিবরণ উপস্থাপিত করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে দীনেশচন্দ্র সেনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

দীনেশচন্দ্র সেন ১৯১৩ সালে ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত 'সৌরভ' পত্রিকায় চন্দ্রকুমার দে লিখিত 'চন্দ্রাবতী' প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধ পড়ে এ-বিষয়ে কৌতূহলী হন এবং পরে চন্দ্রকুমার দে-র অনুসন্ধান করে তাঁকে গীতিকা সংগ্রহে উদ্বুদ্ধ করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চন্দ্রকুমার দে-র জন্য বৃত্তি মঞ্জুরের ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীকালে তিনি এ-কাজে নগেন্দ্রচন্দ্র দে, বিহারীলাল রায়, আশুতোষ চৌধুরী, কবি জসিমউদ্‌দীন প্রমুখকে ব্রতী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর এসব উদ্যোগের ফলে 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা'-র তিন খণ্ড প্রকাশিত হয়। তিনি এই চারটি খণ্ডে প্রকাশিত গীতিকাসমূহের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশেরও ব্যবস্থা করেন। বাংলা ও ইংরেজি খণ্ড-

গুলোর ভূমিকায় তিনি গীতিকাসমূহের সংগ্রহ-সম্বন্ধীয় তথ্যাবলী পরিবেশন করেই নিবৃত্ত থাকেননি, সংকলন ও সম্পাদনাসূত্রে গীতিকা উদ্ভবের আর্থ-সামাজিক, রাষ্ট্রীয়-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি ব্যাখ্যা করেছেন এবং গীতিকায় বিধৃত চরিত্রসমূহের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য, এর কাব্যমূল্য, ভাষা ও প্রকৃতিসংলগ্নতার উপাদানসমূহও বিশ্লেষণ করেছেন। দীনেশচন্দ্র সেন গীতিকা সংগ্রহের জন্য প্রত্যক্ষ শ্রম স্বীকার হয়ত করেননি, কিন্তু এর সংকলন ও সম্পাদনায় তিনি যে সাধনাধর্মী একনিষ্ঠা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছেন, তা তুলনাহীন। সংকলন ও সম্পাদনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

> তিনি যেমন শুনিয়াছিলেন তেমনই সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমি সেগুলি যথাসাধ্য শৃঙ্খলার মধ্যে আনিয়াছি। এই তিন-চার বৎসর যাবৎ আমি এই গাথাগুলির অনুবাদ, টীকা ও টিপ্পনী লেখা ও ভূমিকা রচনা ছাড়া সংগ্রহ সম্বন্ধে বিস্তর উপদেশ দিয়াছি এবং প্রতি পালাটি বিশেষ বিশেষ সর্গে বিভক্ত করিয়াছি। গান গাওয়ার সময়ে গায়কেরা যে বিরাম গ্রহণ করেন, লিখিত রচনায় সেরূপ বিরাম লওয়ার অবকাশ নাই, সুতরাং ঐভাবে বিভাগ না করিলে গাথাগুলির পয়ার নিতান্ত একঘেয়ে হইয়া যায়।[১১]

গীতিকাসমূহের সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে দীনেশচন্দ্র সেন যে কৌতূহল, শ্রমঘন নিষ্ঠা ও একাগ্রতা প্রদর্শন করেছেন, তাতে তাঁর প্রবল স্বদেশানুরাগ ও স্বাজাত্যবোধের পরিচয়ই গভীরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। সম্পাদনাসূত্রে দীনেশচন্দ্র সেন গীতিকা উদ্ভবের যে পটভূমি ব্যাখ্যা করেছেন, তা আজও অনতিক্রান্ত।

সংগ্রহ ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে দীনেশচন্দ্র সেন-এর পরে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক সংকলিত গীতিকাসমূহের অধিকাংশ সংগ্রহ ও সম্পাদনার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।[১২] 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' প্রকাশিত হওয়ার পর এদিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তবে এর পূর্বেই তিনি পূর্ববঙ্গের 'গায়েন' ও 'বয়াতী'দের মুখ থেকে বেশ কিছু

গীতিকা শুনেছিলেন। তাঁর কাছে প্রকাশিত গাথাগুলির কিছু অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি দৃষ্ট হওয়ায় তিনি তা পুনঃসংগ্রহে অনুপ্রাণিত হন। এ-বিষয়ে তাঁর বক্তব্য নিম্নরূপ :

> প্রকাশিত পালাগুলিতে দেখিলাম কোনো কোনো স্থলে ঘটনার কিছু অংশ বাদ গিয়াছে। বহু জায়গায় বর্ণনা পারম্পর্যহীন, একজনের উক্তি আর একজনের মুখে চলিয়া গিয়াছে। বহু গানের শব্দসজ্জা ও বানান বিভ্রাটের ফলে ভাটিয়ালী গানের কোনো ধাঁচ ও লহরেই পড়ে না। পরে দেখিয়াছি, 'পূর্ব্বঙ্গ গীতিকা' তিন খণ্ডে প্রকাশিত 'মুড়াই', 'ভাওইয়া', 'সাইগরী' ও 'হাল্‌দাফাটা' সুরের গানগুলিরও ঐ একই অবস্থা।[১৩]

ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক ১৯৩৩ সালে গীতিকা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়ে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ময়মনসিংহ, ঢাকা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও ফরিদপুর জেলায় ভ্রমণ করে প্রকৃত 'গায়েন' ও 'বয়াতী'দের নিকট থেকে গীতিকাগুলো সংগ্রহ করেন। কেবল গাথা সংগ্রহই নয়, তিনি এসব গাথার সুর, তাল, ছন্দ সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় বহু তথ্য সংগ্রহ করে তা গ্রন্থভুক্ত করেছেন। ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকের সম্পাদনায় এসব গীতিকা 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' শিরোনামায় সাত খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৯৭০-৭৫ সালে।[১৪] প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তিনি গাথাগুলির ছন্দ, তার সংগ্রহ-উদ্যমের কারণ, সংগ্রহ কাজে অভিজ্ঞতা প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সন্নিবেশ করার পাশাপাশি প্রতিটি গাথার ভূমিকায় তার সংগৃহীত গাথার সঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত গাথার ভিন্নতা-অভিন্নতা বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন করেছেন। গীতিকার অভ্যন্তরে কাহিনী বর্ণনায় যেখানে অস্পষ্টতা আছে সেখানে তিনি সহজবোধ্য কথ্য ভাষায় ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন।

দীনেশচন্দ্র সেন নিজে সংগ্রহকাজে ব্যাপৃত না থাকায় তাঁর সম্পাদনায় যে-সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায় তা ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক নিজে সংগ্রহ ও সম্পাদনা করায় দূরীভূত হয়েছে। কিন্তু দীনেশচন্দ্র সেনের শিক্ষিত পরিশীলিত মানসিকতা গীতিকার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমি ব্যাখ্যায় যে সমৃদ্ধি প্রদর্শনে সক্ষমতা দেখিয়েছে, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকের সম্পাদনায় তা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। উভয়ের সম্পাদনা তাই পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ছাড়া কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ও স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যম দুই যুগকাল ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিককে গাথা সংগ্রহের কাজে যে ব্যাপৃত রেখেছে, তাতেই তাঁর প্রবল সাহিত্যানুরাগ, ঐতিহ্যানুরাগ ও স্বদেশ-প্রেমের পরিচয় অকৃত্রিমভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

এরপরে উল্লেখযোগ্য বদিউজ্‌জামান সম্পাদিত মোমেনশাহী গীতিকা। বাংলা একাডেমী নিয়োজিত সংগ্রাহক মোহাম্মদ সাইদুর কর্তৃক কিশোরগঞ্জ এলাকা থেকে সংগৃহীত ছয়টি গীতিকার সম্পাদনা করেছেন তিনি।[১৫] ছয়টি গীতিকাই সম্পূর্ণ নতুন, অর্থাৎ দীনেশচন্দ্র সেন কিংবা ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকের সম্পাদনায় এসব গীতিকা স্থান পায়নি। সম্পাদনা-সূত্রে ছেচল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাপী এক ভূমিকায় তিনি গীতিকার সংজ্ঞা, পট-ভূমি, মুসলমানী প্রভাব, এর আন্তর্জাতিক মূল্য, ভাষা, প্রয়োজনীয়তা, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে লোকঐতিহ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে এর প্রভাব প্রভৃতি বিষয় আলোচনার পাশাপাশি সম্পাদিত গীতিকাগুলোর সংগ্রহ, পরিচয়, সংগ্রাহকের পরিচয় সম্বন্ধেও প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন করেছেন। বদিউজ্‌জামানের শ্রম প্রাতিষ্ঠানিক কর্তব্যপালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; অধিকন্তু পাকিস্তানী আমলের রাষ্ট্রীয় সাম্প্রাদায়িক চেতনা দ্বারাও তাঁর বক্তব্য কতকাংশে প্রভাবিত।

প্রসঙ্গত আলি নওয়াজ-এর 'ময়মনসিংহ-গীতিকা' গ্রন্থটি উল্লেখ-যোগ্য।[১৬] এ-গ্রন্থে মূলত 'দেওয়ানা মদিনা' ও 'কাজলরেখা' গাথার ওপর আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া উক্ত গাথাদ্বয়ের আলি নওয়াজ ও আবদুর রাজ্জাককৃত সংশোধিত পাঠ পরিবেশন করার পাশাপাশি এ-গ্রন্থে ময়মনসিংহের গীতিকায় বিধৃত মানুষের চিত্র, এর ভাষা এবং অন্য দেশের গীতিকা বিশেষত চীন দেশের গীতিকার সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এসব আলো-চনা উচ্চমানের নয়। অধিকন্তু গাথাদ্বয়ে ব্যবহৃত শব্দসমূহের আদ্যা-ক্ষরের ক্রমানুযায়ী অর্থ সাজিয়ে একটি অভিধান তৈরি করে গ্রন্থে সংযুক্ত করা হয়েছে। গীতিকা সংগ্রহ ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ নয়।

৩

সংগ্রহ ও সম্পাদনা বিষয়ে আলোচনার পরে ময়মনসিংহ-গীতিকার মূল্যায়ন প্রসঙ্গটি বিবেচ্য। এযাবৎকালে ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গের

গীতিকার ওপর বিচ্ছিন্ন বিশ্লেষণের যেসব উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে তিনজন আলোচকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : আশুতোষ ভট্টাচার্য[১৭], ক্ষেত্র গুপ্ত[১৮] ও শিবচন্দ্র লাহিড়ী[১৯]।

দীনেশচন্দ্র সেনের পরে আশুতোষ ভট্টাচার্যই প্রথম তাঁর 'বাংলার লোক-সাহিত্য' শীর্ষক গ্রন্থে ময়মনসিংহ ওপূর্ববঙ্গ গীতিকার ওপর সুদীর্ঘ পরিসরে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। গাথা বা গীতিকার তত্ত্বগত মীমাংসায় যেমন পূর্ববঙ্গের গীতিকা প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে, তেমনি এর সামাজিক পটভূমি, ঘটনাবিন্যাস, চরিত্র ও চরিত্রায়ণ অর্থাৎ এর শিল্পমূল্য নিরূপণের জন্য একটি পৃথক পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন লেখক। তিনি পাশ্চাত্য গীতিকার সঙ্গে এর তুলনামূলক বিচার, গীতিকায় বিধৃত ভারতীয় আদিম সমাজের বৈশিষ্ট্য, এর ছন্দ, উপজীব্য সমাজ, নারীত্বের আদর্শ—ভারতীয় সাহিত্যের সঙ্গে সেই আদর্শের ভিন্নতা-অভিন্নতা, গীতিকায় বিধৃত ব্রাহ্মণ্য সংস্কার, বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে গীতিকার সম্পর্ক, এর ভাষা প্রভৃতি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। গাথাগুলির স্বতন্ত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মূলত 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র গাথাগুলিই আলোচিত হয়েছে। তবে এর বাইরে 'ধোপার পাট', 'মইষাল বন্ধু', 'ভেলুয়া', 'ইশা খাঁ মসনদালি', 'নিজাম ডাকাতের পালা' ও 'চৌধুরীর লড়াই' শীর্ষক গাথাগুলিই আলোচিত হলেও সেসব আলোচনা বিস্তৃত নয়। একারণে আশুতোষ ভট্টাচার্যের বিশ্লেষণকে পূর্ণাঙ্গ বলা অসম্ভব। আশুতোষ ভট্টাচার্য এসব গীতিকা ময়মনসিংহ অঞ্চলে উদ্ভবের সামাজিক পটভূমি আলোচনার ব্যাপারে যতটুকু বিশ্লেষণমনস্ক ও ইতিহাসের গভীরে অনুসন্ধানপ্রবণ, গাথাগুলির কাব্যমূল্যনিরূপণে তত যত্নবান কিংবা অনুশীলন-প্রয়াসী নন। তাঁর আলোচনা তুলনামূলক বিস্তৃত হলেও গভীরতর বিশ্লেষণধর্মী নয়। তিনি গাথার কাহিনী বিবৃত করেছেন কিন্তু কাহিনীর অভ্যন্তর-ক্রিয়াকে সূক্ষ্ম বিজ্ঞানমনস্ক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করতে পুরোপুরি সক্ষম হননি।

এদিক থেকে শিবচন্দ্র লাহিড়ী ও ক্ষেত্র গুপ্তের আলোচনা আধুনিক কাব্য-সমালোচকদের মতো বিষয়বস্তুর অন্তর্গূঢ় প্রদেশে পর্যবেক্ষণদৃষ্টির আলোকপাত ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। তবে তাঁদের আলোচনাও 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র গণ্ডি অতিক্রম না করায় আয়তন-বিচারে পূর্ণাঙ্গ নয়। ক্ষেত্র গুপ্ত তাঁর 'প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য-জিজ্ঞাসা ও নব

মূল্যায়ন' গ্রন্থের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' শীর্ষক আলোচনায় গীতিকার রোমান্সধর্মিতার অন্তরালে বাস্তব জীবনচিত্র পরিবেশন, গীতিকায় বিধৃত প্রণয় সম্পর্কের বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং কাহিনীসমূহের বিয়োগান্তক পরিণতি সম্পর্কে ঋদ্ধ মন্তব্য করেছেন। তিনি গীতিকাসমূহের প্রণয়ভাবনার বহুবঙ্কিম রূপ সম্পর্কে সুশৃঙ্খল ও যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পাশাপাশি গাথাগুলোর সংগঠন ও চরিত্রায়ণ সম্পর্কিত বিশ্লেষণপ্রয়াসে বিজ্ঞানমনস্কতা ও সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব-বোধের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার উদাহরণ :

> চন্দ্রাবতী গাথাটির আখ্যান-গ্রন্থন নিখুঁত। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে কেবলমাত্র অতি প্রয়োজনীয় ঘটনাগুলিকে নাটকীয়-ভাবে উপস্থাপিত করে কাহিনীটিকে সম্পূর্ণ করা হয়েছে। গীতিকাটির নাটকীয় গুণধর্ম অনস্বীকার্য চমৎকারিত্বে কাহিনীকে মণ্ডিত করেছে। নাটকীয় গুণধর্ম বলতে আমরা প্রধানতঃ বুঝি action বা ঘটনাসংকুল পরিস্থিতি এবং conflict বা ব্যক্তিত্বের সহিত ব্যক্তিত্বের, প্রবৃত্তির সহিত প্রবৃত্তির কিংবা বিপরীত ঘটনার মধ্যকার সংঘাত। আলোচ্য গীতিকায় এই দুটি লক্ষণই প্রবল।[২০]

শিবচন্দ্র লাহিড়ী তাঁর 'বাঙলা কাব্যে উপমালোক' গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে 'মৈমনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা' শীর্ষক আলোচনায় মূলত ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত গাথাসমূহের উপমা-অলঙ্কারের স্বরূপ নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন। শিরোনামায় পূর্ববঙ্গ গীতিকার কথা উল্লেখ থাকলেও ময়মনসিংহ অঞ্চলের বাইরে দু একটি মাত্র গাথাই তাঁর আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেকারণে আয়তনবিচারে যেমন তাঁর আলোচনা পূর্ণায়ত নয়, তেমনি অলঙ্কার-আলোচনার দিক থেকেও তা পূর্ণাঙ্গ নয়। কেননা তিনি গীতিকায় উপমা ব্যবহারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনেই কেবল তাঁর প্রয়াস সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তবে উপমা বিচারে তার পর্যবেক্ষণ-শীল দৃষ্টি যেমন সামগ্রিকতাস্পন্দী তেমনি বিষয়বস্তুর অন্তর্প্রদেশ ব্যবচ্ছেদে সার্থকতামণ্ডিত। গীতিকায় উপমা ব্যবহারের সকল বৈশিষ্ট্য ও মাত্রাকে যথার্থভাবে চিহ্নিত করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। উপমা চয়নের ক্ষেত্রে রচয়িতাগণের প্রকৃতিসংলগ্নতা, জনজীবনসম্পৃক্ততা এবং অভিজ্ঞতার বলয়ের সফল ব্যবহারকে তিনি যথাযথভাবে উন্মোচিত

করেছেন। আধুনিক শিল্পসমালোচকের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণক্ষম দৃষ্টিতে শিবচন্দ্র লাহিড়ীর বিশ্লেষণের একটি উদাহরণ :

> সুন্দরী বেদের মেয়ে মহুয়ার রূপ যেন সাপের মাথার মণি। বেদে জীবনের ভাবাঙ্গে এ রূপ গঠিত। 'সাপের মাথার মণি'তে ভয়ঙ্কর-সুন্দরের যুগল রূপ-সমাবেশ। শেষ ছত্রে কনক-চাঁপার সোনারও কন্যার মুখে, একথা বলেও যেমন, শুনেও তেমনি সুখ। চতুর্থ দৃষ্টান্তে নারীদেহ 'পান্‌সী'। সদাগর বাণিজ্য-তরী থেকে মহুয়ার রূপ সম্বন্ধে উক্তি করেছে। পান্‌সীর উপমান সোনার হলেও সম্ভোগমিশ্র। দেহযোগশাস্ত্রে 'নৌকা' নারীদেহের প্রতীক। সদাগর জীবনের প্রতিবেশ থেকে নেওয়া এরূপের প্রয়োগফল যথাযথ।...[২১]

ক্ষেত্র গুপ্ত ও শিবচন্দ্র লাহিড়ীর আলোচনা যেমন আধুনিক সাহিত্য বিচারের মাপকাঠি দ্বারা পরিচালিত হয়ে সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণধর্মী হয়ে উঠেছে, ময়মনসিংহের গীতিকা বিবেচনায় তেমন গভীরতর অভিনিবেশ-মূলক আলোচনা আর পরিদৃষ্ট নয়।

তবে এ-প্রসঙ্গেই দীনেশচন্দ্র সেনের বক্তব্য বিবেচনা করা যেতে পারে। দীনেশচন্দ্র সেন ময়মনসিংহসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গাথা সংগ্রহের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ এবং সংগৃহীত গাথাগুলোর সংকলন ও সম্পাদনার মধ্যেই তাঁর প্রয়াসকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, তিনি গীতিকাসমূহের স্বতন্ত্র বিচার বিশ্লেষণেও প্রবৃত্ত হয়েছেন। সম্পাদিত গীতিকা-খণ্ডসমূহে ভূমিকাসূত্রে গাথাগুলোর উদ্ভবের পটভূমি ব্যাখ্যা, গাথাসমূহের ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্র-চিত্রণের তাৎপর্য, ভাষা ও অলঙ্কার ব্যবহারের বিষয়ে তাঁর বিস্তৃত বিশ্লেষণ-প্রয়াস সম্বন্ধে ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'গ্রন্থে 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র কয়েকটি গাথার ওপর স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ রয়েছে।[২২] তাছাড়া দীনেশচন্দ্র সেনের 'বৃহৎ বঙ্গ', 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান' ও 'আশুতোষ স্মৃতিকথা'প্রভৃতি গ্রন্থেও 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' ও 'পূর্ব্বঙ্গ গীতিকা'র নানা প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে দীনেশচন্দ্র সেন-এর বিশ্লেষণে আবিষ্কার-গৌরবের উচ্ছ্বাস কিংবা ভাবালুতা-দোষ দৃষ্ট হলেও তিনিই একমাত্র

গীতিকাসমূহে বিধৃত বৈশিষ্ট্যের সকল প্রান্তকে তাঁর আলোচনায় স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছেন। দীনেশচন্দ্র সেনের শ্রমসাধ্য সংকলন-সম্পাদনা ও বিশ্লেষণে জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্যানুরাগ, গভীর দেশপ্রেম, জাতীয় অহমবোধের চেতনা নিয়ে আত্মআবিষ্কারে প্রবৃত্ত হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তিনি গীতিকাসমূহের চরিত্রায়ণ-বৈশিষ্ট্য, সংগঠনবিচার, রসনিষ্পত্তি কিংবা অলঙ্কারজিজ্ঞাসার আলোচনায় আধুনিকমনস্কতার পরিচয় দিতে সক্ষম হননি।

ইতিহাসবিদগণের আলোচনা আমাদের পরবর্তী বিবেচ্য। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা সূত্রে অনেকেই ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন, কিন্তু এর মধ্যে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ পরিলক্ষিত হয় না। ইতিহাস-আলোচকদের মধ্যে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়[২৩], নন্দগোপাল সেনগুপ্ত[২৪], সুকুমার সেন[২৫], তারানাথ ভট্টাচার্য[২৬] ও অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের[২৭] নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' শীর্ষক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্গত এক উপ-অধ্যায়ে ময়মনসিংহ-গীতিকার ওপর আলোচনা করেছেন। ময়মনসিংহ-গীতিকার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাঁর আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে সীমাবদ্ধ। তিনি এর বাস্তবনিষ্ঠতার কথা তুলে ধরার পাশাপাশি প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন যে 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' উপন্যাস-সাহিত্যের উৎপত্তির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত।"[২৮] তাঁর ভাষায়, "বাঙলাদেশের সাহিত্যের আর কোথাও অবিমিশ্র বাস্তবতার এমন তীক্ষ্ণ, তীব্র আত্মপ্রকাশ দেখা যায় না।··· উপন্যাস সাহিত্যের পূর্ব সূচনার দিক দিয়া 'ময়মনসিংহ-গীতিকা'র প্রয়োজনীয়তা সর্বথা স্বীকার্য"।[২৯] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বক্তব্য প্রশ্নসাপেক্ষ।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ভিন্ন অন্য সকলেই 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' ও 'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা'র প্রাচীনত্ব, অকৃত্রিমতা ও প্রামাণিকতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে তাঁদের আলোচনায় ইতি টেনেছেন। এরমধ্যে তারানাথ ভট্টাচার্য ও অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনাই যুক্তিনিষ্ঠ ও সহানুভূতিশীল। কিন্তু নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও সুকুমার সেনের আলোচনা অতিমাত্রায় সংক্ষিপ্ত, একদেশদর্শী ও কেবলমাত্র অভিযোগপূর্ণ। প্রসঙ্গত

জসীমউদ্‌দীনের[৩০] স্মৃতিকথামূলক আলোচনার বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। জসীমউদ্‌দীন তাঁর 'ঠাকুরবাড়ীর আঙিনায়' শীর্ষক গ্রন্থে স্মৃতিচারণা-মূলক বক্তব্যসূত্রে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র প্রামাণিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এঁদের সকলের বক্তব্য প্রসঙ্গান্তরে বিস্তৃতভাবে উল্লেখিত ও বিবেচিত হবে।

লোক-সাহিত্য আলোচনা সূত্রে ময়মনসিংহ-গীতিকা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে আশুতোষ ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য। ইতঃপূর্বে তাঁর বক্তব্য বিষয়ের বিবেচনা উপস্থাপিত হয়েছে। আশুতোষ ভট্টাচার্যের পরে রওশন ইজদানী[৩১] ও ড. আশরাফ সিদ্দিকীর[৩২] নাম উল্লেখযোগ্য। রওশন ইজদানী তাঁর 'মোমেনশাহীর লোক-সাহিত্য' গ্রন্থে 'পালা-গীতি' শীর্ষক একটি অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তাকারে মৈমনসিংহ ও পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকার ওপর আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনা বিশ্লেষণমূলক নয়, বর্ণনাধর্মী ও ভাবালুতাদুষ্ট। এদিক থেকে আশরাফ সিদ্দিকীর আলোচনা তাৎ-পর্যপূর্ণ। তিনি তাঁর 'লোক-সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 'গীতিকা' শীর্ষক উপ-অধ্যায়ে মৈমনসিংহ ও পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার ওপর আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনা কেবলমাত্র তুলনামূলক বিচারেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। গীতিকার সাধারণ বৈশিষ্ট্য আলোচনাসূত্রে যেমন তিনি ইউরোপীয় গীতিকার সঙ্গে বাংলা গীতিকার তুলনামূলক বিচার উপস্থাপন করেছেন, তেমনি গাথাগুলোর স্বতন্ত্র আলোচনার পর্যায়েও তুলনামূলক বিচারের প্রয়োজনে ইউরোপীয় গীতিকার উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া গীতিকা সংগ্রহের স্বীয় অভিজ্ঞতাকেও তিনি তুলনামূলক বিবেচনার সঙ্গে সমন্বিত করেছেন। তিনি মৈমনসিংহ গীতিকার মটিফ নির্ণয় করে এর শ্রেণীবিভাজন করেছেন এবং এর উচ্চ সাহিত্যমূল্য আলোচনাসূত্রে বিদেশী মনীষীদের এ-সম্পর্কিত মতামত উপস্থাপন করেছেন।

প্রসঙ্গত তিনটি গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য। তাৎপর্যহীন এই গ্রন্থত্রয়ের দুইটিকে 'পাকিস্তানী যুগের সৃষ্টি' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এসব গ্রন্থে 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' ও 'পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা'র অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গাথার কাহিনীকে গল্পরূপ দিয়ে পরিবেশন করা হয়েছে। 'পাকিস্তানের-লোক-কাহিনী'[৩৩] শীর্ষক গ্রন্থে 'দেওয়ানা মদিনা', 'ফিরোজ খান দেওয়ান' ও 'মহুয়া' গাথার গল্পরূপ দিয়েছেন যথাক্রমে আবদুল কাদির, আ. ন. ম. বজলুর রশীদ ও সৈয়দ আলী আহসান।

'পূর্ব পাকিস্তানের লোক-গীতিকা'[৩৪] শীর্ষক গ্রন্থে ষোলটি গাথার গল্প-রূপ রয়েছে। ষোলটির মধ্যে সাতটি গাথা ময়মনসিংহ অঞ্চলের। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ গল্পরূপ দিয়েছেন 'মহুয়া' ও 'ভেলুয়া' গাথার, আবদুল কাদির 'মাঞ্জুর মা' ও 'কাফেন চোরা' গাথার, আবুল ফজল 'নেজাম ডাকাতের পালা'র, মুহম্মদ আবদুল হাই 'মলুয়া' ও 'কাঞ্চনমালা' গাথার, আ. ন. ম. বজলুর রশীদ 'মদনকুমার ও মধুমালা' এবং 'সুরতজামাল ও অধুয়া' গাথার, মাহ্বুব-উল্-আলম 'নছর মালুম' গাথার, মোহাম্মদ ইদরিস আলী 'চৌধুরীর লড়াই' গাথার, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী 'আয়না বিবি' গাথার, আহমদ শরীফ 'দেওয়ান ভাবনা' গাথার, মযহারুল ইসলাম 'দেওয়ান ঈসা খাঁ' গাথার এবং কাজী দীন মুহম্মদ 'পীর-বাতাসী' এবং 'নুরুন্নেহার ও কবরের কথা' গাথার গল্পরূপ দিয়েছেন।

'ময়মনসিংহ গীতিকার গল্প'[৩৫] শীর্ষক ডা. যামিনীকান্ত সিংহের গ্রন্থটিতে 'কঙ্ক ও লীলা', 'রূপবতী', 'মহুয়া' ও 'কাজলরেখা'—এই চারটি গাথার গল্পরূপ প্রকাশিত হয়েছে। এসব গল্পরূপদানে লেখকের কোনো দক্ষতা কিংবা উৎকর্ষের পরিচয় ব্যক্ত হয়নি। প্রথম দুটি গ্রন্থে নামকরণ পরিবর্তনের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ পরিদৃষ্ট হয়, যেমন: 'দেওয়ানা মদিনা' গাথার নাম 'দেওয়ান ও মদিনা' কিংবা 'ফিরোজ খান দেওয়ান' গাথাটির নাম 'সখিনা' হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে।

ময়মনসিংহ-গীতিকা চর্চার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ দুসান ঝাভিতেল-এর 'বেঙ্গল ফোক-ব্যালাডস ফ্রম ময়মনসিংহ অ্যাণ্ড দি প্রব্লেম অফ দেয়ার অথেনটিসিটি' শীর্ষক গ্রন্থটি।[৩৬] ময়মনসিংহ-গীতিকা বিবেচনার ক্ষেত্রে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ এই গ্রন্থের আলোচনা স্বাভাবিকভাবে বিস্তৃত হবে। তাছাড়া এই গ্রন্থে ময়মনসিংহ-গীতিকা সম্পর্কিত যে-প্রশ্নটি গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়েছে সে-প্রশ্নে বিভিন্ন সমালোচকের মতামত পূর্বেই যাচাই করা প্রয়োজন।

৪

ময়মনসিংহ-গীতিকা সম্পর্কে এ যাবৎকালের আলোচনায় এর অকৃত্রিমতা বা প্রামাণিকতার বিষয়টি প্রধান বিতর্কিত প্রশ্ন হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

সাহিত্য সমালোচক, গবেষক ও সংগ্রাহকগণ দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত গীতিকাসমূহের ভাষা, অভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তু, নামকরণ প্রভৃতি নানা উপাদানের প্রামাণিকতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। প্রশ্ন উত্থাপনকারীদের বক্তব্য একই ধারায় প্রবাহিত হয়নি, বরং তাঁদের বক্তব্যের অভ্যন্তরেও রয়েছে নানারূপ বৈপরীত্য। তাছাড়া একজনের বক্তব্যকে অন্যজনের বক্তব্য দ্বারা সহজেই খণ্ডন করা যায়। এ-প্রসঙ্গে প্রধান প্রধান বক্তব্য উপস্থাপনকারীর বিবেচনাসমূহ উপস্থাপনেযোগ্য। আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন:[৩৭]

> তিনি (চন্দ্রকুমার দে) গীতিকাগুলি যেভাবে শুনিয়াছিলেন, সেইভাবেই সংগ্রহ করিয়াছেন—ইহাদের ভাব, ভাষা, ভঙ্গি সবই তাঁহার নিজের নিকট সুপরিচিত ছিল ; সেইজন্য যাহা শুনিয়াছেন, তাহা লিখিয়া লইবার পক্ষে কোন অন্তরায় হয় নাই ;...
>
> ...স্বর্গত চন্দ্রকুমার দে যেভাবে গীতিকাগুলি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সেইভাবেই সেগুলি প্রকাশিত করিয়া দিলে, কিংবা কোন trained investigator এর সহায়তায় তাহা সম্পাদন করিয়া প্রকাশিত করিলে ইহাদের যে মূল্য প্রকাশ পাইত, স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মধ্যস্থতায় তাহা প্রকাশিত হওয়ায় তাহাদের সেই মূল্য প্রকাশ পায় নাই। এই বিষয়ে স্বর্গত চন্দ্রকুমার দে'র যে অধিকার ছিল, স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সেই অধিকার ছিল না ; অথচ তিনিই এই ভার নিজের উপর গ্রহণ করিয়া নিজের ইচ্ছামত ইহাদিগকে এক একটি ভদ্ররূপ দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।...

গীতিকার কৃত্রিমতাদোষের জন্য স্পষ্টতঃই আশুতোষ ভট্টাচার্য দীনেশচন্দ্র সেনকে দায়ী করেছেন। তাঁর প্রধান অভিযোগ দীনেশচন্দ্র সেন গীতিকাগুলোকে শিক্ষিতজনের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য এর ভাষা ও কাঠামোর পুনর্বিন্যাস সাধন করেছেন। সুকুমার সেনের বক্তব্যে কেবলমাত্র দীনেশচন্দ্র সেনই অভিযুক্ত হননি, সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দেও সমানভাবে অভিযুক্ত হয়েছেন। সুকুমার সেন বলেছেন:[৩৮]

> ...চন্দ্রকুমার দে সংগ্রহ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, গাথাগুলির ভাষায় ছন্দে কলম চালাইয়া সেগুলিকে 'ভাল করিয়া সম্পাদন' করিয়া-

ছিলেন। কিন্তু সেকথা তিনি একবারও বলেন নাই। দীনেশ-বাবু চন্দ্রকুমার দে-র কাছে প্রাপ্ত বস্তু সম্পূর্ণরূপে খাঁটি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেইভাবে ছাপাইয়াছিলেন। তবুও মুদ্রিত গাথাগুলিতে স্থানীয় উপভাষার রূপ বজায় রাখার চেষ্টা সত্ত্বেও বাঙ্গালা সর্বজনীন সাধু ভাষার এবং কলিকাতা অঞ্চলের চলিত কাব্যভাষার ছাপ মুছিয়া যায় নাই। মধ্যে মধ্যে আবার পশ্চিমবঙ্গের উপভাষার (এবং সাধু ভাষার) শব্দগুলিকে পূর্ববঙ্গীয় রূপ দিবার চেষ্টা স্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে। ভাষাবিচারে মুদ্রিত গাথাগুলি পুরোপুরি অকৃত্রিম নয়।

কোন কোন গাথায় অন্য গল্পের জোড়াতালি দিয়া অথবা অন্য উপায়ে কাহিনীকে পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত করিয়া আধুনিক কালোচিত রোম্যান্টিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা দেখা যায়।...

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত গীতিকাগুলির মধ্যে যে কয়টি রোম্যান্টিক রচনা শিক্ষিত পাঠকের সর্বাধিক মনোহরণ করিয়াছে সেগুলির কোনটিকেই সর্বাংশে অকৃত্রিম বলা যায় না।...

সুকুমার সেনের অভিযোগ দীনেশচন্দ্র সেন অপেক্ষা চন্দ্রকুমার দে-র বিরুদ্ধে অধিক। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, গাথাগুলিকে ভদ্রজনোপযোগী করার জন্য চন্দ্রকুমার দে-ই প্রধানত দায়ী। নন্দগোপাল সেনগুপ্তও সুকুমার সেনের মতো সংগ্রাহক ও সংকলক উভয়ের বিরুদ্ধে সংগৃহীত গাথাগুলির অকৃত্রিম শরীরে অবৈধ হস্তক্ষেপের অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত এর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সন্দেহ ব্যক্ত করেছেন। তিনি গীতিকার জীবনবোধ ও সাহিত্যমূল্যে আধুনিকতার স্পর্শ অনুভব করে বলেছেন, মধ্যযুগে এগুলো রচিত হলেও সংগ্রাহক সংকলকগণ এর আধুনিক রূপ দিয়ে প্রকাশ করেছেন। নন্দগোপাল সেনগুপ্তের বক্তব্য নিম্নরূপ:[৩৯]

গল্পের গাঁথুনি ও চরিত্রের বাস্তবতায় এগুলি খুব আধুনিক মনে হয়, যদিও সংগ্রাহকরা এগুলিকে ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা বলে প্রচার করেছেন।...

উপধর্ম-কবলিত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে দৌলৎ কাজী ও আলাওলের কাব্য দুটি যেমন বিস্ময়কর, তেমনি বা তার

চেয়েও বিস্ময়কর ময়মনসিংহ-গীতিকা। গীতিকাগুলিও ষোল-আনা মানুষের কাহিনী। তার ভেতর দেবতার হস্তক্ষেপ নেই। এমনকি হিন্দু-মুসলমানের বা উঁচু-নীচুর ভেদও মানেননি কবিরা।

তারপর এদের রচনাপদ্ধতি। তা-ও আশ্চর্য রকম। মঙ্গলকাব্যে হক, বৈষ্ণব কাব্যে হক, সর্বত্র কবিরা পুরানো অলঙ্কার শাস্ত্রের বাঁধা ছক অনুসরণ করেছেন। ...গীতিকার কবিরা কিন্তু উপমা ও অলঙ্কারের ব্যবহারে আগাগোড়া মৌলিক। তাদের ভাষা যেমন সরল, ভঙ্গি তেমন অনাড়ম্বর।...

এই দুই কারণে সন্দেহ জাগে গীতিকার গল্পগুলি পুরাতন, কিছু কিছু অংশও পুরাতন, কিন্তু তাকে ঘষে-মেজে যথাসম্ভব প্রাচীন সাজে সাজিয়ে একালেই লেখা হয়েছে, একালের অনুযায়ী ব্যঞ্জনা দিয়ে।

নন্দগোপাল সেনগুপ্তের অভিযোগ অত্যন্ত মারাত্মক ধরনের। গীতিকার পুরনো কাহিনীগুলোকে আধুনিক যুগের উপযোগী করে নতুনভাবে লেখার অভিযোগ আরও একজন করেছেন। তিনি কবি জসীমউদ্‌দীন। গাথা-সংগ্রহকাজে তিনি দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক নিয়োজিত হয়ে চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত গাথাগুলির অকৃত্রিমতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেন। তাঁর অনুমান, চন্দ্রকুমার দে-ই সংগৃহীত গাথাগুলিকে নিজের ভাষায় লিখে নিয়েছেন। জসীমউদ্‌দীন স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেছেন :[৪০]

আমার মনে সন্দেহের উদয় হইল, এগুলি গ্রামে যেভাবে গাওয়া হয় যথাযথ সেইভাবেই সংগ্রহ করা হয় নাই। গীতিকা-সংগ্রাহক উহার উপর কিছু রঙ চড়াইয়াছেন। এই কথা আমি দুই একজন বন্ধু-বান্ধবের নিকট আলোচনা করি। তাহা দীনেশ-বাবুর কানে যায়। দীনেশবাবু আমাকে এ বিষয়ে জবাবদিহি করিতে পত্র লিখিলেন।...তারপর দীনেশবাবুকে সব কথা খুলিয়া লিখিলাম। ...তিনি শুধু লিখিলেন, "এ বিষয়ে তোমার ধারণা ভুল। পরে বুঝিতে পারিবে"।

জসীমউদ্‌দীনের পত্রোত্তরে দীনেশচন্দ্র সেনের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে মৈমনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার প্রামাণিকতা সম্পর্কে উত্থাপিত

প্রশ্ন বিষয়ে দীনেশচন্দ্র সেন অবহিত ছিলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে গীতিকাগুলোকে অকৃত্রিম করে তোলার ব্যাপারে চন্দ্রকুমার দে-র কোনো ভূমিকা নেই। তাছাড়া তিনি যেটুকু পুনর্বিন্যাস করেছেন, তাতে গীতিকাগুলো কৃত্রিমতাদোষে দুষ্ট হয় না। এ প্রসঙ্গে 'প্রাচীন পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা'র সংগ্রাহক-সম্পাদক ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকের বক্তব্য প্রণিধান-যোগ্য :[৪১]

> ...পালা সংগ্রহে ব্রতী হইয়া আমার প্রথমেই উপলব্ধি হইল, কেন সেন মহাশয় সম্পাদিত পালাগুলির ঐ প্রকার অবস্থা ঘটিয়াছে। সেন মহাশয় নিজে বোধহয় পূর্ববঙ্গে ঘুরিয়া কোনো পালাই সংগ্রহ করেন নাই। চন্দ্রকুমার দে, আশু বাবু প্রমুখ পালা সংগ্রাহক ভদ্রমহোদয়গণের সংগৃহীত যাহা কিছু, তাহাই যথাবৎ সেন মহাশয় ছাপাইয়াছেন, একটা আকার-ইকারেরও পরিবর্তন করেন নাই। সংগ্রাহকগণও বোধ হয় কাহারও কাছে কিছু পাইলেই তাহা তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় সেন মহাশয়ের দপ্তরে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, ঐ পালার আরও কিছু কোথাও কাহারও কাছে আছে কিনা, তাহা অনুসন্ধান করেন নাই।

ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকের অভিযোগ অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য। সরকারী বৃত্তিধারী সংগ্রাহকগণের স্বল্প পরিশ্রমের ফলে গাথাগুলির কাহিনীতে অসম্পূর্ণতা কিংবা শিথিল-বিন্যাসের দোষযুক্ত হওয়া স্বাভাবিক। উল্লেখ্য যে কৃত্রিমতার অভিযোগকারীদের মধ্যে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকই একমাত্র স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যম নিয়ে সুদীর্ঘ দুইযুগকাল ভ্রমণ করে প্রকৃত 'গায়েন' ও 'বয়াতী'দের কাছ থেকে গীতিকাগুলো সংগ্রহ করেন। ফলে তার পক্ষেই সত্য উচ্চারণ সম্ভব। এক্ষেত্রে ঐ অঞ্চলের অধিবাসী এবং চন্দ্রকুমার দে-র প্রতিবেশী রওশন ইজদানীর বক্তব্য প্রণিধান-যোগ্য :[৪২]

> ময়মনসিংহ-গীতিকায় সংগৃহীত পালা-গান সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোন ভুল ধারণা নেই। আমারই প্রতিবেশী চন্দ্রকুমার দে যেখানে যেমনটি শুনেছিলেন, কাহিনী ঠিক তেমনটিই সংগ্রহ করেছিলেন। তবে দু'একটি পালার নামকরণে অনধিকার হাত দেওয়া হয়েছে; একথা চন্দ্রকুমার দে জীবদ্দশায় তাঁর বাড়িতে

> বসেই স্পষ্ট স্বীকার করেছিলেন ; যেমন "বাদিয়ানীর পালা"র "মহুয়া" নামকরণ, অথবা "উনার বাইদ্যা"কে "হুমরা বেদে" বলে উল্লেখ, "আলালের দুলাল" পালার "দেওয়ানা মদিনা" নামকরণ ইত্যাদি। মূল বিষয়বস্তু ঠিক আছে ; কাজেই চন্দ্রকুমারের এই সামান্য ত্রুটিকে আমরা ক্ষমার অযোগ্য ব'লে মনে করছিনে।

এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে সংগ্রাহক কর্তৃক গাথার উপরিতলগত কিছু পরিবর্তন সাধন ঘটলেও তা গীতিকাগুলোকে কৃত্রিমতাদোষে দুষ্ট করেনি। এ বক্তব্যও সত্যের নিকটবর্তী। পরবর্তীকালে অসিত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যে তা আরও স্পষ্ট হবে। তিনি উত্থাপিত অভিযোগসমূহের সত্যাসত্য যাচাই করে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। প্রথমে তিনি উত্থাপিত অভিযোগগুলির সারসংক্ষেপ উত্থাপন করে তা খণ্ডন করেছেন। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :[৪৩]

> যাঁরা বলেন, পালাগুলির অধিকাংশই আগাগোড়া চন্দ্রকুমার দে-র রচনা, বাহবা নেবার জন্য তিনি প্রাচীন গাথার ছাপ দিয়ে, এখানে-ওখানে দুটো-চারটে গ্রাম্য শব্দ জুড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ কৃত্রিম আধুনিক রচনার সাহায্যে সরলপ্রাণ দীনেশচন্দ্র বাবুকে প্রবঞ্চনা করেছিলেন—তাঁদের একথা যুক্তিসঙ্গত নয়। ···তবে এ অভিযোগে আমি বিশ্বাসী যে পালাগুলিকে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে সংগ্রহ করা হয়নি। এরজন্য যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও দায়িত্ববোধ থাকা দরকার, তার বিশেষ কোন ব্যবস্থা দীনেশচন্দ্র আজ থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে করতে পারেননি।··· সংগ্রহকারীরা যে নিজ নিজ 'কেরামতি' দেখাবার অথবা কাব্য-কণ্ডূয়ন নিবারণ করবার জন্য সংগৃহীত পালায় হস্তক্ষেপ করেননি, একথা হলপ করে বলা যায় না।···আমাদের অনুমান, অনেকগুলি পালাতে (বিশেষতঃ যেগুলি উৎকৃষ্ট কাব্যগুণময়) সংগ্রহকারীরা অযথা হস্তক্ষেপ করেছিলেন, এমনকি সে দোষ থেকে স্বয়ং দীনেশচন্দ্রও পুরোপুরি রেহাই পেতে পারেন না।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে ময়মনসিংহ-গীতিকা ও বাংলাদেশের অন্যান্য গীতিকার বিরুদ্ধে কৃত্রিমতাদোষের যেসব অভিযোগ পাওয়া যায়,

তালিকাবদ্ধ করলে তার প্রকাশ হবে নিম্নরূপ: প্রথমত, সংগ্রাহকগণ গ্রামীণ জনসাধারণের মুখে যেরূপ শুনেছেন, হুবহু সেরূপে লিপিবদ্ধ করেননি। তারা শিক্ষিতজনের গ্রহণোপযোগী করে তোলার অভিপ্রায় থেকে এর ভাষা, অলঙ্কার ও গঠনকাঠামোর সম্পাদনা করেছেন। কিংবা হুবহু লিপিবদ্ধ করলেও বিভিন্ন জনের কাছ থেকে শুনে কাহিনীর পূর্ণায়ত রূপদানের শ্রম স্বীকার করেননি। দ্বিতীয়ত, সংগ্রাহকগণ এমনকি গাথার কোনো কোনো অসম্পূর্ণ অংশ নিজেরাই সম্পূর্ণ করেছেন অথবা প্রচলিত কাহিনী অবলম্বন করে সম্পূর্ণ নতুনভাবে গাথাটি রচনা করেছেন। তৃতীয়ত, সংকলক-সম্পাদক দীনেশচন্দ্র সেন গাথাগুলির কাহিনীবিন্যাসে সংহতরূপ আনয়নের লক্ষ্যে পরিশীলিত মানসিকতা নিয়ে অনেকগুলি গাথা নতুনভাবে বিন্যস্ত করেছেন। চতুর্থত, গাথার নামকরণ কিংবা চরিত্রের নামকরণের ক্ষেত্রে আধুনিকতার স্পর্শদোষ ঘটেছে। এজন্য সংগ্রাহক, সংকলক উভয়েই দায়ী। দুসান ঝাভিতেল তাঁর গ্রন্থে ময়মনসিংহ-গীতিকার প্রামাণিকতা সম্পর্কিত অভিযোগের প্রতিটি বিষয় নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে মীমাংসায় পৌঁচেছেন। তাঁর গ্রন্থ আলোচনা পর্বে এসব অভিযোগ খণ্ডিত হবে।

৫

প্রাগের চেকোশ্লোভাক বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর অরিয়েন্টাল বিভাগে এক সময়ে কর্মরত ড. দুসান ঝাভিতেল ইউনেস্কোর বৃত্তি নিয়ে এদেশে এসে ময়মনসিংহ-গীতিকার ওপর একটি পূর্ণায়ত গবেষণা পরিচালনা করেন ষাটের দশকের শুরুতে। তাঁরই গবেষণাকর্ম 'বেঙ্গলি ফোক-ব্যালাডস ফ্রম ময়মনসিংহ অ্যাণ্ড দি প্রব্লেম অফ দেয়ার অথেনটিসিটি' (ময়মনসিংহের লোক-গীতিকা এবং তার প্রামাণিকতার সমস্যা) শিরোনামায় গ্রন্থাকারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয়। ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহের ওপর বিশ্লেষণমূলক প্রথম ও একমাত্র স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসেবে ইংরেজি ভাষায় রচিত এই পুস্তকটি বিশিষ্ট ও তাৎপর্যপূর্ণ। দুসান ঝাভিতেল তাঁর গবেষণায় এ যাবৎকালে ময়মনসিংহ গীতিকা সম্পর্কে উত্থাপিত এর প্রামাণিকতার সমস্যাটি মীমাংসায় অগ্রসর হয়েছেন। তবে তিনি কেবল ময়মনসিংহ-গীতিকার প্রামাণিকতার সমস্যা নিয়ে আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকেননি, গীতিকাসমূহের ঘটনা-বিন্যাস, চরিত্র ও চরিত্রায়ণ, বিষয়বস্তু, অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয়ের পূর্ণায়ত

বিশ্লেষণেরও প্রয়াস পেয়েছেন। চার অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থের কেবল-মাত্র প্রথম অধ্যায়ে ও উপসংহারাংশে সম্পূর্ণভাবে প্রামাণিকতার প্রশ্নটি বিশ্লেষিত হয়েছে; দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঘটনাবিন্যাস, চরিত্র-চিত্রণ ও বিষয়বস্তু, তৃতীয় অধ্যায়ে বিষয়গত বৈশিষ্ট্য এবং চতুর্থ অধ্যায়ে অলঙ্কার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। তবে শেষোক্ত তিন অধ্যায়ের আলোচনারও একটি অন্তর্গত লক্ষ্য প্রামাণিকতার প্রশ্ন মীমাংসা। প্রকৃত বিচারে সমগ্র গ্রন্থটি ময়মনসিংহ-গীতিকার প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য থেকে পরিলক্ষিত হয়েছে।

দুসান ঝাভিতেল তাঁর গবেষণা কেবলমাত্র ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত গীতিকাসমূহের ওপর সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এ যাবৎ-কালের আলোচনায় কোনো কোনো সমালোচক কেবল 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' কেউ কেউ 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' সম্পূর্ণ কিংবা অসম্পূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অধিকাংশের আলোচনাই 'মৈমন-সিংহ-গীতিকা'র ওপর সীমাবদ্ধ। কিন্তু 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' বাংলাদেশের সকল গীতিকার কিংবা কেবল ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত গীতি-কারও বৈশিষ্ট্যকে সম্পূর্ণভাবে ধারণ করে না। ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ঊনচল্লিশটি গাথার মধ্যে 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'য় সংকলিত হয়েছে মাত্র দশটি গাথা। এক্ষেত্রে দুসান ঝাভিতেলের পরিকল্পনাটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্মত। তিনি ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ঊনচল্লিশটি গাথাই তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচনে যেমন প্রাসঙ্গিকতার পরিচয় দিয়েছেন তেমনি বিষয়ের পরিধি নির্ধারণেও তাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ ও বাস্তবসম্মত। তাঁর যথার্থ ধারণা, ময়মনসিংহের গাথাগুলিই পূর্ববঙ্গের গীতিকাগুলোর সকল বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে আছে। সেকারণে ময়মনসিংহের গীতিকা-সমূহ মূল্যায়ন করলে পূর্ববঙ্গ গীতিকার সকল বৈশিষ্ট্য উন্মোচন করা সম্ভব। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি তাঁর এই যুক্তির পক্ষে বলেছেন:

> I have chosen Mymensingh because the majority of ballads dealt with here come from this large district;
>
> Moreover, it is no enaggeration to say that Mymensingh represents the very heart of the Bengali folk culture and an exceptionally rich store of folk-art production.

নিম্নে আমরা দুসান ঝাভিতেলের গ্রন্থের অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে তাঁর গবেষণাকর্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থাপনে প্রয়াসী হব। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনামা: দি অথেনটিসিটি অফ দি ব্যালাডস (গাথাসমূহের প্রামাণিকতা)। এই অধ্যায়ে লেখক বাংলা-ভাষী বিভিন্ন সমালোচক কর্তৃক গীতিকার অকৃত্রিমতা প্রশ্নে উত্থাপিত নানা বক্তব্য উল্লেখ করে তাঁর যৌক্তিকতা বিচার করেছেন এবং প্রামাণিকতার পক্ষে স্বীয় মতামত উপস্থাপন করেছেন। প্রথমেই তিনি প্রামাণিকতার বিরুদ্ধে প্রবলতম অভিযোগ উত্থাপনকারী নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও ও জসীমউদ্‌দীনের বক্তব্য উত্থাপন করেছেন। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত গীতিকার বিষয়বস্তু ও শৈলী—উভয়দিকে আধুনিকতার স্পর্শ অনুভব করে এসব গীতিকা মধ্যযুগীয় কালপর্বে রচিত হওয়া অসম্ভব বলে যে মত ব্যক্ত করেছেন, লেখক তা খণ্ডন করে দেখিয়েছেন যে মধ্যযুগীয় কালপর্বেও সাহিত্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিধৃত হওয়া সম্ভব ছিল। দীনেশচন্দ্র সেন গাথাগুলির রচনাকাল ষোড়শ শতকেরও পূর্বে এমনকি চতুর্দশ কিংবা ত্রয়োদশ শতক বলে যে অনুমান করেছেন সে ব্যাপারেও নন্দগোপাল সেনগুপ্ত সন্দেহ পোষণ করে বলেন যে গীতিকার রচনা-কাল এত প্রাচীন হওয়া অসম্ভব। লেখক নন্দগোপাল সেনগুপ্তের শেষোক্ত সন্দেহের সঙ্গে কিছুটা একমত পোষণ করলেও এর প্রামাণিকতা প্রসঙ্গে তাঁর সংশয়মূলক বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করেন।—

> I agree with Nandagopal Sengupta, sharing his doubts concerning the antiquity of the songs. But, unlike him, I have no doubts at all as far as their authenticity is concerned.
> (p. 15)

গাথাগুলির অস্তিত্ব গ্রামাঞ্চলে খুঁজে পাওয়া যায় না—এই মত ব্যক্ত করে উসীমউদ্‌দীন সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে এগুলি চন্দ্রকুমার দে-র নিজেরই রচনা। জসীমউদ্‌দীনের এই সন্দেহও লেখক খণ্ডন করেছেন। যদিও ১৯৬০ সালে লেখক জসীমউদ্‌দীনের সঙ্গে একত্রে ময়মনসিংহের প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরে কোথাও এর অস্তিত্ব লক্ষ্য করেননি, তবু তিনি অন্যান্য ব্যক্তিত্বের সাক্ষ্য উপস্থাপন করে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন যে চন্দ্রকুমার দে যখন এগুলি সংগ্রহ করেন তখন পর্যন্ত ওসব গাথা

গান হিসেবে পরিবেশনের প্রচলন গ্রামাঞ্চলে ছিল। বাল্যকালে গ্রামাঞ্চলে গান পরিবেশন করতে দেখেছেন ও শুনেছেন—এমন দুজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ উপস্থাপন করে তিনি বিজ্ঞানসম্মতভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে লোকসাহিত্যের ধারা ক্রমবিলীয়মান, বর্তমানে এর প্রচলন নেই তাই বলে কোনোকালে এর অস্তিত্ব ছিল না—এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অযৌক্তিক।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও জসীমউদ্‌দীনের প্রবলতর অভিযোগ খণ্ডনের পর লেখক সুকুমার সেনের প্রধানত ভাষা সম্পর্কিত সন্দেহের বিষয়টি উত্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে লেখক স্বীকার করেন যে গীতিকার ভাষায় ময়মনসিংহের উপভাষা ভিন্ন অন্য অঞ্চলের ভাষার প্রভাব হয়ত রয়েছে, কিন্তু সেকারণে গীতিকার প্রামাণিকতা সর্বাংশে প্রশ্নসাপেক্ষ হয়না।

লেখক নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, জসীমউদ্‌দীন ও সুকুমার সেনের প্রবল বিরোধী-বক্তব্যের বিপরীতে আশুতোষ ভট্টাচার্য, মনসুরউদ্দীন, রওশন ইজদানী ও চিত্তরঞ্জন দেবের এ-সম্পর্কিত সহানুভূতিশীল ও যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্য উপস্থাপন করে স্বীয় মতের পক্ষে যুক্তি দৃঢ়তর করেন। ইতঃপূর্বে আশুতোষ ভট্টাচার্যের বক্তব্য উদ্ধৃত করে দেখানো হয়েছে যে তিনি গীতিকার সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদনা বিষয়ে অধিকতর অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল এমন মন্তব্য করলেও এগুলির বিশুদ্ধতা নিয়ে কোনো মারাত্মক প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। রওশন ইজদানীর ইতঃপূর্বে উদ্ধৃত বক্তব্যেও দেখা যায় তিনি চন্দ্রকুমার দে কর্তৃক গাথার নামকরণ বা ভাষার সামান্য পরিবর্তনকে ক্ষমার অযোগ্য ত্রুটি বলে মনে করেননি এবং এতে বিষয়বস্তুর কোনো পরিবর্তন ঘটেনি বলেই মত ব্যক্ত করেছেন। অথচ এই প্রশ্নটি উত্থাপন করেই সুকুমার সেন সকল গীতিকার বিশুদ্ধতা নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। প্রকৃতপক্ষে দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতার প্রশ্নটি এখানে বিবেচ্য। ময়মনসিংহ অঞ্চল সম্পর্কে অবহিত কারও পক্ষে জসীমউদ্‌দীনের মতো এমন প্রশ্ন উত্থাপন করা অসম্ভব যে ঐ অঞ্চলে এসব পালাগানের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি, অতএব গীতিকাগুলি চন্দ্রকুমার দে-র স্বরচিত। ঐ অঞ্চলের অধিবাসী রওশন ইজদানীর বক্তব্যেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন কি পরবর্তীকালেও ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক যে ঐসব অঞ্চল

থেকেই এসব গাথা সংগ্রহ করে সম্পাদনা করেন, তাতেও জসীমউদ্‌-দীনের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণিত হয়।

দুসান ঝাভিতেল ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত 'সৌরভ' সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সংগৃহীত তথ্য উপস্থাপন করে এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ করে দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত গীতিকাসমূহের প্রামাণিকতা প্রসঙ্গে উথাপিত নেতিবাচক বক্তব্যসমূহ খণ্ডন করেন। তাঁর বক্তব্য পূর্ণাঙ্গ করার জন্য প্রথম পরিপূরক হিসেবে উপসংহারাংশ ব্যবহৃত হয়। উপসংহারাংশে তিনি সুনির্দিষ্টভাবে তাঁর সমগ্র গীতিকার বিশ্লেষণের সারাংশ উপস্থাপন করে দেখান যে গীতিকা-সমূহ গভীরতর অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে ঐসব নেতিবাচক বক্তব্যের যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। যেভাবে গীতিকাগুলো সংগ্রহ ও সম্পাদনা করা হয়েছে তার পক্ষে, গীতিকাসমূহের অস্তিত্ব বর্তমানে ধ্বংস হওয়ার পক্ষে কিংবা এর ভাষার পক্ষে সকল যুক্তি-সম্মত ব্যাখ্যা গীতিকার দেহেই · বর্তমান। লেখক সুদৃঢ় মত ব্যক্ত করেন যে এসব গীতিকা চন্দ্রকুমার দে কর্তৃক লিখিত—এমন অনুমান যাঁরা করেছেন তাঁদের সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে অমূলক। এর একটি বড় প্রমাণ, চন্দ্রকুমার দে ছাড়াও অন্য অনেকে গীতিকা সংগ্রহ করেছেন।

উপসংহারাংশে তিনি ১৯৬২ সালের ২২ এপ্রিল কলিকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় 'দীনেশচন্দ্র ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার প্রামাণিকতা প্রসঙ্গে' শীর্ষক নিবন্ধ প্রকাশ করার বিষয়টি উথাপন করে বলেন যে এই নিবন্ধ প্রকাশের পর তাঁর বক্তব্যের পক্ষে পরপর কয়েকটি নিবন্ধ একই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। চিত্তরঞ্জন দেব, রবীন্দ্র-নাথ গুপ্ত, বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী প্রমুখ সমালোচকগণ তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে আরও যুক্তি উথাপন করেন। তাছাড়াও ঐ সময় তারানাথ ভট্টাচার্য তাঁর সদ্য প্রকাশিত "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : প্রাচীন পর্ব" শীর্ষক গ্রন্থটি লেখকের নিকট প্রেরণ করলে তাতেও অনেক সমর্থন-সূচক মন্তব্য পাওয়া যায়।

তারানাথ ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থে যুক্তি উথাপন করে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন যে বাংলা সাহিত্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা মধ্যযুগে বর্তমান ছিল। যাঁরা পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মউর্ধ্ব প্রণয়-

ভাবনার বিষয়টি উত্থাপন করে এর বিশুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁদের বক্তব্য খণ্ডন করে তিনি দেখান যে 'পদ্মাবতী' বা 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে অসাম্প্রদায়িক প্রণয়চেতনার চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে।

দুসান ঝাভিতেল দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা'র চারটি খণ্ডের প্রামাণিকতার পক্ষে যেসব যুক্তি উপস্থাপন করেছেন তা বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যনির্ভর। তিনি কোনোরূপ পূর্বধারণা থেকে কিংবা পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে গবেষণাকার্যে ব্রতী হননি। এক্ষেত্রে সাধারণভাবে তিনি লোক-সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ, বাংলাদেশে লোক-সাহিত্যের উদ্ভব, এশীয় লোকসাহিত্য ও ইউরোপীয় লোকসাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের বৈভিন্ন্য সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগীয় নিদর্শনসমূহ ও ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে লোকসাহিত্য ধারার সামঞ্জস্য-অসামঞ্জস্য, ভিন্নতা-অভিন্নতা, পারস্পরিক প্রভাব ও স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি বিষয়েও বিশ্লেষণমূলক মন্তব্য করেছেন।

"থীমস্ অ্যাণ্ড কম্পোজিশন" শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়টি এ-গ্রন্থের সব চেয়ে দীর্ঘ অধ্যায়। এ অধ্যায়ে একত্রিশটি গাথার বিষয়বস্তু ও কাহিনীবিন্যাস সম্পর্কে পৃথকভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। ঘটনাবিন্যাসের আলোচনাসূত্রে চরিত্র-চিত্রণের কৌশল ও দক্ষতা সম্পর্কেও মন্তব্য করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে দুসান ঝাভিতেল ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত গাথাসমূহ তাঁর বিশ্লেষণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত গাথার সংখ্যা ঊনচল্লিশ। এরমধ্যেও আটটি গাথা তাঁর দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্বতন্ত্র আলোচনা থেকে বাদ পড়ার কারণ সেগুলির মধ্যে গাথাধর্মের অনুপস্থিতি। 'দস্যু কেনারামের পালা', 'কাজলরেখা', 'কাঞ্চন মালা', 'মদনকুমার ও মধুমালা', 'গোপিনীকীর্তন', 'সন্নমালা', 'চন্দ্রাবতীর রামায়ণ', 'রাজা তিলক বসন্ত' প্রভৃতি আটটি গাথা আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। গাথাধর্মের অনুপস্থিতি ছাড়া এগুলির মধ্যে রূপকথাধর্মিতা, প্রচলিত ধর্মীয় কাহিনীর অনুসরণ কিংবা কাহিনীর অসম্পূর্ণতা প্রভৃতিও আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কারণ।

বিষয়বস্তু ও ঘটনাবিন্যাসের আলোচনায় লেখকের পরিমিতিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। গুরুত্ব অনুযায়ী এ-পর্বে তাঁর আলোচনা দীর্ঘ কিংবা সংক্ষিপ্ত হয়েছে। প্রথম দশটি গাথার আলোচনায় যেখানে তাঁর

তিয়াত্তর পৃষ্ঠা ব্যয় হয়েছে সেখানে পরবর্তী একুশটি গাথার জন্য ব্যয় হয়েছে মাত্র তেত্রিশ পৃষ্ঠা। প্রতিটি গাথার আলোচনার প্রথমে তিনি কাহিনীটি সংক্ষিপ্তাকারে বিবৃত করেছেন, অতঃপর ঘটনা-বিন্যাসের কৌশল, চরিত্রায়ণের দক্ষতা সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক মন্তব্য করেছেন। এ-পর্বে তাঁর মন্তব্য পূর্ববর্তী অধ্যায়ের তুলনায় অধিকতর সূক্ষ্ম ও মনোবিশ্লেষণাত্মক। ভিন্ন-ভাষী হওয়া সত্ত্বেও লেখক গাথাগুলির চরিত্র সম্পর্কে যথার্থ বিশ্লেষণ করতে যে সক্ষম হয়েছেন, তাতে এদেশের মানুষের চরিত্রবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে, বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও আবহাওয়ায় লালিত এদেশের মানুষের বিশেষভাবে গড়ে ওঠা মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর গভীর অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়। 'ধোপার পাট' গাথার দুইটি ভাষ্য সংকলিত হয়েছে 'পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডে। এই দুটি ভাষ্য সম্পর্কে লেখক তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে এবং এর অন্তর্নিহিত কারণ ও যথার্থতা সম্পর্কে সূক্ষ্ম মন্তব্য করেছেন। ঘটনাবিন্যাস ও বিষয়বস্তু আলোচনায় তিনি সংকলক-সম্পাদক দীনেশচন্দ্র সেনের বক্তব্য ছাড়াও অন্য সমালোচকগণের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য উপস্থাপন করে যথার্থ গবেষকের ন্যায় স্বীয় বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি সুদৃঢ় করেছেন, আবার কখনও তাঁদের বক্তব্য খণ্ডন করে স্বীয় বক্তব্যকে তথ্যপ্রমাণসহ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। লেখক চরিত্রের অন্তর্গত সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুটনের ক্ষেত্রে যে বিশ্লেষণধর্মী বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তার একটি উদাহরণ নিম্নরূপ:

> ...She does not betray him for the sake of the merchant's wealth or at the insistence of the hermit All this makes her a true *ideal* of a woman. On the other hand however she does not represent any superhuman ideal of womanhood of the type with which we not frequently meet in classical Indian poetry. (p. 36)

চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং প্রণয়াকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্বস্ততার মধ্য দিয়ে মহুয়া চরিত্রটি কিভাবে আদর্শ রমণীর মর্যাদা লাভ করল, সে বিষয়ে লেখকের এই বক্তব্য সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তির পরিচায়ক। চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে লেখক ভারতীয় পুরাণ-ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁর গভীরতর জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রায়ণের তাৎপর্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে লেখকের আধুনিক সূক্ষ্ম সাহিত্যবোধের পরিচয়ও স্পষ্ট। গাথা রচয়িতাদের পরিমিতিবোধ প্রসঙ্গে লেখকের মন্তব্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়:

> He never criticizes them, he does not condemn them, he neither appraises not blames. His pose is that of an *unconcerned narrator* of other people's doings and adventures...(p. 35-36)

"কমন ফিচারস্ অফ দি ব্যালাড্স্" শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে লেখক গাথাগুলিতে বিধৃত কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে গাথা-রচয়িতাদের আদর্শগত ও শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি, হিন্দু-মুসলিম উপাদানের মিশ্রণ, গায়ক প্রসঙ্গ, গীতিকা-সমূহে বিধৃত প্রকৃতি ও বারমাসীর স্বরূপ, প্রবাদ-প্রবচন ও রচয়িতাদের নাম স্বাক্ষরের পদ্ধতি, মিত্রাক্ষর ছন্দের কৌশল প্রভৃতি।

লেখক আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন যে গাথা-রচয়িতাদের মধ্যে আধুনিক যুগে যে-অর্থে শ্রেণী-সচেতনতা শব্দটি ব্যবহৃত হয়, সেধরনের শ্রেণী-সতর্কতা ছিল না। গাথা-রচয়িতা-গণ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জীবন, জীবনের সুখ-দুঃখ, সংগ্রাম প্রভৃতি বিধৃত করেছেন ; কিন্তু এই উপস্থাপনের মধ্যে তাদের শ্রেণী-সচেতনতা ক্রিয়াশীল নয়। শ্রেণী-সচেতনতা বলতে যেমন কোনো শ্রেণীর স্বীয় স্বার্থ সম্পর্কে পক্ষপাতিত্ব এবং মানবসমাজের গতিচঞ্চলতার ক্ষেত্রে শ্রেণী-সম্পর্ককে প্রাথমিক শর্ত হিসেবে গণ্য করার সচেতন উপলব্ধিকে বোঝায় তেমন শ্রেণী-সচেতনতা গাথা-রচয়িতাদের মধ্যে ছিল না।

> I donot think, however, that we can rightly speak of their class-consciousness in the sense un which for instance, we use this term when analyzing modern literature. Class-consciousness means prefering class interests to any other and considering class relations as a primary factor in human society ;...(p. 119)

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের জীবনবৈশিষ্ট্যসমূহকে যে গাথাসমূহে অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বিধৃত করা হয়েছে, সে বিষয়টি লেখক যথাযথভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাছাড়া গীতিকা-গুলির জনসমাবেশে গীত হওয়ার বিষয়টিই যে এর কাব্যমূল্যের

ক্ষেত্রে প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে বর্তমান এবং এক্ষেত্রে গায়কদের যে রয়েছে এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা—তা নির্ণয়েও লেখকের অনুসন্ধিৎসু মনের পরিচয় পাওয়া যায়। গীতিকাসমূহে প্রকৃতি একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়ে উপস্থিত। প্রকৃতি এখানে জীবন্ত, চরিত্রসমূহের জীবনসংগ্রামের সহায়ক-শক্তি। মানবানুভূতির সঙ্গে পরস্পরিত করে উপস্থাপিত হয়েছে প্রকৃতি। প্রকৃতি চিত্রায়িত হয়েছে নরনারীর প্রিয়বিরহকাতর বারমাসী দুঃখ বর্ণনাসূত্রে। প্রকৃতির নানারূপ ব্যবহার সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য যথাযথ-ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তবে ময়মনসিংহের গীতিকায় প্রকৃতি ব্যব-হারের তাৎপর্যময়তা সম্পর্কে বিশ্লেষণ যত বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন ছিল, তার অভাব দেখা যায় লেখকের সংক্ষিপ্ত আলোচনায়। বিভিন্ন প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার, কোনো কোনো গীতিকায় রচয়িতাদের নামোল্লেখ, গীতিকার মিত্রাক্ষর ছন্দকৌশল প্রভৃতি বিষয় লেখক গবে-ষকের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন।

চতুর্থ কিংবা শেষ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে অলঙ্কার প্রসঙ্গ। "সিমিলিস অ্যান্ড মেটাফোর্স্" শীর্ষক এই অধ্যায়ে লেখক ময়মন-সিংহের গীতিকায় অলঙ্কার ব্যবহারের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করলেও কোন ধরনের উপমান ব্যবহারের মধ্য দিয়ে রচয়িতার কি প্রকার মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে কিংবা কি প্রকারের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে, তা বিশ্লেষণে লেখকের দৃষ্টি প্রসারিত নয়। অলঙ্কার আলোচনাও পূর্ণাঙ্গ নয়। কেবলমাত্র উপমা-রূপকের আলোচনায়ই লেখক অলঙ্কার-বিশ্লেষণ সীমাবদ্ধ রেখেছেন। যদিও গীতিকাসমূহে ব্যবহৃত অলঙ্কারের মধ্যে উপমা-রূপকই প্রধান, কিন্তু এর বাইরেও নানা ধরনের অলঙ্কার ব্যবহারের উদাহরণ গীতিকাসমূহে পরিদৃষ্ট হয়। তাছাড়া শব্দালঙ্কার প্রসঙ্গ লেখক সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছেন। বলা যায়, লেখকের অলঙ্কার-আলোচনা প্রধানত ক্যাটালগিংয়ে সীমাবদ্ধ থেকেছে।

এই গ্রন্থের শিরোনামা অনুযায়ী বিষয়বস্তু পরিকল্পনায় সীমাবদ্ধতার দিক তেমন দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। ময়মনসিংহের গীতিকার বিশ্লেষণ এবং সেই সূত্রে এর প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠার আলোচনায় লেখকের সার্থকতাই অধিকতর। ভিন্ন-ভাষী ইউরোপীয় নাগরিক হয়েও বাংলার লোক-সাহিত্যের এই সমৃদ্ধ নিদর্শনটির মূল্যায়নে লেখক যে গভীর অনুসন্ধিৎসা

ও বিশ্লেষণপ্রবণ মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তাঁর একনিষ্ঠ ও আন্তরিক পরিশ্রমেরই স্বাক্ষর সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভিন্ন-ভাষী হওয়ার কারণে ভাষা উপলব্ধিতে দু'একটি ত্রুটি পরিলক্ষিত হলেও তা অনুল্লেখযোগ্য। তবে সীমাবদ্ধতার উল্লেখযোগ্য দিক হল: গীতিকা-সমূহ বিশ্লেষণে লেখক যত-না এর সাহিত্যমূল্যের প্রতি সতর্ক , তত সামাজিক-মূল্যের প্রতি নন। সাহিত্য-বিশ্লেষণে সমাজবাস্তববাদী দৃষ্টি-ভঙ্গি অনুসরণে লেখকের সীমাবদ্ধতা অতিমাত্রায় প্রকট। এসব গীতিকা উদ্ভবের পেছনে কোন বিশেষ আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রীয়-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পটভূমি ক্রিয়াশীল কিংবা এসব গীতিকার অভ্যন্তরে কোন ধরনের সামাজিক চিত্র ও সমাজভাবনার অভিপ্রকাশ ঘটেছে তা মূল্যায়নে লেখক কোনো আগ্রহই দেখাননি। এর ঘটনাবিন্যাস, চরিত্রায়ণ, কিংবা সাধারণ বৈশিষ্ট্য, অলঙ্কার—এসব কাব্যমূল্য বিশ্লেষণে লেখকের দৃষ্টি সমাজ সত্যের গভীরে প্রোথিত নয়। যুক্তি হতে পারে, লেখক প্রামাণিকতার সমস্যা নিয়েই আলোচনা করেছেন এবং সেকারণে সামাজিক পটভূমি কিংবা সামাজিক প্রতিফলন আলোচনা প্রাসঙ্গিকতা লাভ করেনি। এ-যুক্তি কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে, তা বিচারসাপেক্ষ। তবে গীতিকার প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠায় লেখকের শ্রমঘন বিশ্লেষণধর্মিতা সার্থকতা অর্জন করেছে নিঃসন্দেহে।

৬

দুসান ঝাভিতেলের গ্রন্থটির সীমাবদ্ধতা ময়মনসিংহ-গীতিকার সামগ্রিক চর্চার সীমাবদ্ধতাকেই আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। লোকসাহিত্যের পুনর্মূল্যায়ন, এর আধুনিক বিচার জাতীয় ঐতিহ্য অনুসন্ধানের আন্ত-র্গরজেই প্রয়োজন ; ঐতিহ্যের স্বরূপ উন্মোচন ও জাতীয় আত্মআবিষ্কারের আন্তর্তাগিদেই তা আবশ্যক। আমরা যদি আমাদের জাতীয় চৈতন্যকে মৃত্তিকাসংলগ্ন করতে চাই, তাহলে ঐতিহ্য অনুসন্ধানের বিকল্প নেই। ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত গীতিকাসমূহ আমাদের বাংলা লোকসাহিত্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ প্রান্ত। জাতীয় চেতনার পূর্ণায়ত পরিপুষ্টির প্রয়োজনেই সমাজবাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে এর যথার্থ মূল্যায়ন প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

তথ্যনির্দেশ

১ পূর্ববঙ্গ গীতিকা, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, রায় বাহাদুর ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন, ডি.লিট্. কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মার্চ ১৯৩০, ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য

২ মোমেনশাহীর লোক-সাহিত্য, রওশন ইজদানী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফাল্গুন ১৩৬৪, পৃষ্ঠা ৫৭

৩ প্রাগুক্ত, এবং লোক-সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড, ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, মুক্তধারা, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৮৩

৪ পূর্ববঙ্গ গীতিকা, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত

৫ লোক-সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত

৬ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮২-৮৩

৭ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৩

৮ প্রাগুক্ত

৯ প্রাগুক্ত

১০ প্রাগুক্ত

১১ মৈমনসিংহ-গীতিকা, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, রায় বাহাদুর-বি.এ., ডি. লিট্. কর্তৃক সঙ্কলিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, চতুর্থ সংস্করণ : ১৯৭৩, ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য

১২ দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত চার খণ্ডে গাথার সংখ্যা চুয়ান্ন, তার মধ্যে ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত গাথার সংখ্যা উনচল্লিশ। ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত সাত খণ্ডে গাথার সংখ্যা উনপঞ্চাশ। উভয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত গাথার সংখ্যা তেত্রিশ।

১৩ প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, প্রথম খণ্ড, সম্পাদক : ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৭০, ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য

১৪ 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র সাতটি খণ্ড পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে 'ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়' গ্রন্থসংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত হয়। প্রকাশকাল ; প্রথম খণ্ড : ১৯৭০ সাল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড : ১৯৭১ সাল, চতুর্থ খণ্ড : ১৯৭২ সাল, পঞ্চম খণ্ড : ১৯৭৩ সাল, ষষ্ঠ খণ্ড : ১৯৭৪ সাল এবং সপ্তম খণ্ড : ১৯৭৫ সাল।

১৫ মোমেনশাহী গীতিকা, বদিউজ্জামান সম্পাদিত, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, জানুয়ারী ১৯৭১। ছয়টি গীতিকার নাম : সোনাই

বিবি, চিলাই রাণী, মনোয়ার খাঁ দেওয়ান, তোতা মিয়া, মাধব মালঞ্চি কন্যা, গকুল চান ও আইধর চান।

১৬ ময়মনসিংহ-গীতিকা, আলি নওয়াজ, সিটি লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬৯

১৭ বাংলার লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড : আলোচনা), শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ : ১৯৬২ (প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৪)

১৮ প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন, ক্ষেত্র গুপ্ত, গ্রন্থ নিলয়, কলিকাতা, ১৩৬৬ (১৯৫৯—৬০)

১৯ বাঙলা কাব্যে উপমালোক, শিবচন্দ্র লাহিড়ী, গ্রন্থ-নিলয়, কলিকাতা, ১৯৬৫

২০ প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫৮

২১ বাঙলা কাব্যে উপমালোক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১২

২২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশচন্দ্র সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, (দুই খণ্ডে সমাপ্ত), নবম সংস্করণ : ১৯৮৬, দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টাংশ দ্রষ্টব্য

২৩ বঙ্গসাহিত্য উপন্যাসের ধারা, শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ : ১৩৮০

২৪ বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৮, ১৯৫৮

২৫ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড অপরার্ধ (সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দ), শ্রী সুকুমার সেন, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ : ১৯৭৫

২৬ বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস : প্রাচীন পর্ব, তারানাথ ভট্টাচার্য, এস. গুপ্ত ব্রাদার্স, কলিকাতা, ১৯৬২

২৭ বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (খ্রীষ্টীয় দশম-বিংশ শতাব্দী), অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৬৬

২৮ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬

২৯ প্রাগুক্ত

৩০ ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়, জসীমউদ্‌দীন, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ : জুলাই ১৯৬৮

৩১ মোমেনশাহীর লোক-সাহিত্য, রওশন ইজদানী, প্রাগুক্ত

৩২ লোক-সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড, ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত

৩৩ পাকিস্তানের লোক-কাহিনী, পাকিস্তান পাবলিকেশান্‌স্, ঢাকা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ (প্র. সং ১৯৫৩)

৩৪ পূর্ব পাকিস্তানের লোক-গীতিকা, পাকিস্তান পাবলিকেশান্‌স্, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৬২, (প্র, সং ১৯৫৫)

৩৫ ময়মনসিংহ গীতিকার গল্প, ডা. যামিনীকান্ত সিংহ, শান্তি লাইব্রেরী, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৬৫ (১৯৫৯)

৩৬ Bengali Folk Ballads From Mymensingh and the Problem of their Authenticity, by Dr. Dusan Zbavitel, University of Calcutta, 1963.

৩৭ বাংলার লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড : আলোচনা), শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭-১৮

৩৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড : অপরার্ধ (সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দ), শ্রী সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬০৩-০৪

৩৯ বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৩-৪৬

৪০ ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়, জসীমউদ্‌দীন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৭

৪১ প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ১ম খণ্ড, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক, প্রাগুক্ত, ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য।

৪২ মোমেনশাহীর লোক-সাহিত্য, রওশন ইজদানী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৭

৪৩ বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (খ্রীষ্টীয় দশম-বিংশ শতাব্দী), অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৬২-৬৩